ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 72- 78
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.181

সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

সুপ্রিতা নাথ, *স্বাধীন গবেষক, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 22.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore holds a significant place in Bengali literature because of his unique writing style and choice of subjects. From his childhood to adulthood, he closely observed the lives of women, including those in his own Thakurbari. These observations inspired him to address the conditions of women in society. In his stories such as 'Strirpatra', 'Haimanti', and 'Denapawna', we see how newly married women faced extreme struggles under the dominance of others. Tagore highlights how the dowry system in society gradually harms women, leading not only to social problems but also to their exploitation. Some women suffer and even die due to domestic violence and conflicts within their husbands' families. This pressure often leaves women helpless, yet some rise against oppression. By speaking out against violence, these women become symbols of courage. Through his creation of female characters, Tagore aims to present strong and courageous individuals who inspire other women to raise their voices against injustice.

Keywords: Rabindranath Tagore, Women's Empowerment, Dowry System, Domestic Violence, Female Resistance in Literature

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক ছোটগল্পকার। তাঁর ছোটগল্পে সমসাময়িক নানান ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হয়েছে নারীচরিত্র। সেখানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নারীর উপর সামাজিক অত্যাচার, শাশুড়ির দুর্ব্যবহার, পণপ্রথার আড়ালে নানান চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা, শ্বশুরবাড়ির অপমান, অনাদর, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নারীর আত্মমর্যাদার লড়াই। রবীন্দ্রনাথের নারীরা কখনো অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, আবার কখনো উনিশ শতকের নারী হয়েও আশ্চর্য রকমের স্বাধীনচেতা। এই স্বাধীনচেতার উৎস হয়তো ঠাকুরবাড়ির নারীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিহিত। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশে নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা অনুভব করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ শুরুর দিক থেকেই বাস্তব জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই নারীজীবনকে ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। বর্তমান সমাজকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের সঙ্গে আজকের সমাজের নারীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাঁর বহু রচনায় নারীরা অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে এবং অন্যায়ের শিকার হয়ে আত্মবলিদান দিয়েছে। আবার বহু রচনায় দেখা যায় নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফলে তাঁর গল্পে নারীরা বারবার নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর চরিত্রচিত্রণ শুধু ব্যক্তিগত বেদনা বা পারিবারিক সংকটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবেও প্রতীয়মান। তাঁর লেখায় নারী কেবল নিপীড়িত নয়, বরং সংগ্রামী সত্তা হিসেবেও উঠে আসে। একদিকে সামাজিক কুসংস্কার, কৃত্রিম বন্ধন, ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার নারীর করুণ বাস্তবতা দেখা যায়, অন্যদিকে শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও

আত্মমর্যাদাশীল নারীর উত্থানও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই দ্বৈত রূপই রবীন্দ্রনাথের নারীর বৈশিষ্ট্যকে অনন্য করেছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প— 'দেনাপাওনা', 'স্ত্রীরপত্র' ও 'হৈমন্তী'—কিভাবে নারীর বিচিত্র রূপকে প্রতিফলিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

পারিবারিক সমস্যার কারণে দিনের পর দিন বহু পরিবার ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। সেই পারিবারিক সমস্যার অন্যতম কারণ হলো যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ছোটগল্পে একদিকে যেমন সমাজের আনন্দ ও বেদনার কথা তুলে ধরেছেন ঠিক সেই রূপ নারীর সামাজিক অবস্থান, তার অধিকার ও পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত নারীর অবস্থান ও ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের এমনই এক কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র-এর ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এই গল্পে শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচারে অপমানিত হৈমন্তীর চরম দুর্দশার কাহিনি ফুটে উঠেছে। এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা নগ্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই হৈমন্তীর সঙ্গে কথকের বিবাহ। অপুর সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন অপুর বাবা, কারণ পণের অঙ্ক ছিল অনেক বেশি।

> "তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।"[১]

কথকের পিতা মূলত এক লোভী প্রকৃতির মানুষ। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গল্পের সেই সময়কালে মেয়েদের বয়স একটু বেড়ে গেলে বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত; অথচ পুরুষেরা বয়স বাড়লেও একাধিক বিবাহ করতে পারত। অবশেষে টাকার লোভেই হৈমন্তীর সঙ্গে অপুর বিয়ে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে হৈমন্তী ছিল পিতার স্নেহে লালিত। পিতা ও কন্যার সম্পর্কে ছিল না কোনো আড়াল-আবডালহীন বন্ধন। বিয়ে শেষে অন্য কন্যাদের মতো অশ্রু না ফেলায় হৈমন্তীকে নিয়ে পরিবারের লোকজন নানা সমালোচনা করে।

> "বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!"[২]

হৈমন্তী ছিল মূলত সংবেদনশীল ও আদর্শবাদী চরিত্র। পিতার ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই কন্যা কখনো মিথ্যে, প্রতারণা বা অন্যায় মেনে নিতে পারেননি। বিয়ের প্রথম দিকে তাকে তেমন কষ্ট দেওয়া হয়নি; বরং অপুর বাবার বিশ্বাস ছিল, হৈমন্তীর পিতা রাজমন্ত্রী এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। সেই ভ্রান্ত ধারণায় হৈমন্তীকে যথেষ্ট স্নেহে রাখা হতো, যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয়।

> "রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নীচে নামে না। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল।"[৩]

কিন্তু অবশেষে যখন প্রকাশ পায় যে অপুর শ্বশুর প্রকৃতপক্ষে রাজমন্ত্রী নন, বরং শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, এবং বিয়েতে দেওয়া টাকা-পয়সা ও গয়নাও ধার করা, তখন থেকেই হৈমন্তীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রতারণা শুরু হয়। বিশেষত, রাস উপলক্ষে গ্রাম থেকে আত্মীয়রা এলে হৈমন্তীকে নিয়ে নানা তির্যক মন্তব্য শোনা যায়।

> "দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল...আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"[৪]

গল্পে প্রচলিত সময়কালে সমাজে নারীদের ছোটবেলা থেকেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় গড়ে তোলা হতো, যাতে তারা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু হৈমন্তীর পিতা ছিলেন এক আধুনিক শিক্ষানুরাগী মানুষ। তিনি কন্যাকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, কিন্তু গৃহস্থলি কাজ শেখাননি। ফলে শ্বশুরবাড়িতে পদে পদে হৈমন্তীকে কটুক্তি ও প্রতারণার শিকার হতে হয়।

> "ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"[৫]

হৈমন্তী পিতার বিরুদ্ধে অপবাদ শুনে প্রতিবাদ করলে তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা শুরু হয়। সে বাবাকে নিয়মিত চিঠি লিখলেও শ্বশুরবাড়িকে নিয়ে পিতার কাছে কোনো অভিযোগ করেনি। তবুও তার চিঠি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুলে দেখত। একসময় হৈমন্তীর পিতা মেয়েকে দেখতে এলে তার অসুস্থ দেহ দেখে মর্মাহত হন এবং বাড়ি নিয়ে যেতে চান। কিন্তু অপুর পিতা তাতে বাধা দেন। ডাক্তার দেখানোর পরও অপুর পিতা উপহাস করে বলেন—

> "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!"[৬]

পিতাকে অপমানিত অবস্থায় ফিরে যেতে দেখে হৈমন্তীর মুখের হাসি চিরদিনের মতো নিভে গেল। গল্পের শেষে দেখা যায়, হৈমন্তীকে মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত করে একেবারে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কথকের নতুন বিয়ের আয়োজন শুরু হয়।

> "শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, হইাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ-- থাক্ আর কাজ কী!"[৭]

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বাস্তব জীবনের এক তীব্র বাস্তব প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। গল্পে চিরাচরিত ধারা অনুসারে নববধূর উপর শ্বশুর-শাশুড়ির লাঞ্ছনা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি দেখা যায় এক শিক্ষিত আত্মসম্মানবোধ নারী কিভাবে পারিবারিক লোভ ও যৌতুক প্রথায় জর্জরিত হয়ে লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হয়েছে। হৈমন্তীর স্বামী অপু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তার নীরবতা স্ত্রীর উপর অত্যাচারের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলে, যা পুরুষ সমাজে দুর্বল ও ভীরুতাকে উন্মোচিত করে। গল্প কথক সহানুভূতিশীল হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস সে দেখাতে পারেনি। দিনের পর দিন অত্যাচার সহ্য করে অবশেষে হৈমন্তী নীরব প্রতিবাদের পথ বেছে নেন, আর সেই প্রতিবাদই তাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়।

দীর্ঘকাল ধরে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন যাতনায় কাতর হয়ে যখন নারী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখনই জন্ম নেয় প্রতিবাদ। নারীর সেই প্রতিবাদকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গড়ে তুলেছেন 'স্ত্রীরপত্র' ছোটগল্প। সমাজে নারীর সৌন্দর্য বলতে তার পারিবারিক মূল্য কিংবা কাজের দক্ষতার উপর তাকে সীমাবদ্ধ রাখা হত। নারীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিংবা স্বাধীনতা সমাজে স্থান পেত না। গল্পের মূল চরিত্র মৃণাল সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ঘটিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব দেখিয়েছে। অন্যায়কারীর ও অত্যাচারীর প্রতি তীব্র নিন্দার মাধ্যমে মৃণাল তখনকার এবং বর্তমান সমাজে আদর্শ নারীর প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। গল্পটি আমাদের শেখায় নারীর মর্যাদা শুধুমাত্র সমাজ কিংবা তার পরিবারের উপর নির্ভর করে না বরং তার নিজের সাহস এবং নিজের উপর থাকা আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এই গল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন:

> "এ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের কাছে নারীর পত্র; গল্পটির নাম 'নারীর পত্র' হইতে পারিত।"[৮]

পুরুষ আধিপত্যের শিকার হয়ে যে নারীরা চরণতলাশ্রয়ী হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন, সেই ইচ্ছা মৃণালের কখনও ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন স্বামী ও পরিবারের সহকর্মিনী বা সহধর্মিণীর সমান মর্যাদায় জীবন যাপন করতে। গল্পে দেখা যায় যে তখনকার সমাজে নারীকে ব্যক্তিমূল্য থেকে বেশি রূপের কারণে পরিবারের সঠিক গৃহবধূ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মৃণালকে ছোটবেলা থেকেই নানা লোকের নানা কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে। নারীকে শুধু প্রাপ্ত বয়সে নয়, শিশুকালেও সামাজিক দৃষ্টি ও আক্রমণ থেকে বঞ্চিত করা হতো। মৃণাল যখন শিশু বয়সে জ্বর নিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে, তখন প্রতিবেশিরা তা নিয়ে বলে,

> "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল; বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত? চুরিবিদ্যায় যমপাকা দামী জিনিসের পরেই তার লোভ।"[৯]

বড় হওয়ার পর মৃণালের বিবাহ হয় শুধুমাত্র রূপের কারণে। কিন্তু রূপের আড়ালে মৃণালের চরম বুদ্ধির উপেক্ষা করা হয়; শশুরবাড়ির লোকরা পদে পদে তাকে অবজ্ঞা করে।

> "তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছো।"[১০]

স্বামীর বাড়িতে প্রতিদিনের বেদনার স্মৃতি বৃদ্ধি পায়। মৃণাল যখন কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তখন আতুরঘরের খারাপ পরিবেশের কারণে তার মেয়ের মৃত্যু ঘটে। মেয়ের মৃত্যুর ফলে মৃণালও মৃত্যুর ইচ্ছায় জর্জরিত হয়। বুড়ো মায়ের মৃত্যুর পর আশ্রয়ের আশায় বড়ো জায়ের বোন বিন্দু যখন তাদের বাড়িতে আসে, তখন শশুরবাড়ির অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। বিন্দুকে দাসদাসী থেকে নিচু কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বড়ো জা, এই দৃশ্য দেখে, নিজের বোনকে আশ্রয় দিতে এমন কাজে নিযুক্ত করেন যে মৃণালের লজ্জা হল:

> "তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।"[১১]

মৃণাল মূলত একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী। নারীর কষ্ট তাকে বেদনার মধ্যে ফেলে। অবশেষে, মৃণাল বিন্দুকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেন। মৃণালের এই সদয় আচরণের ফলে বাড়ির লোকের হিংসা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বিন্দুর শরীর লাল হওয়া দেখেই পরিবার তাকে বসন্ত বলে অপবাদ দেয়। একদিন, বাজুবন্ধ চুরি হলে, সবাই বিন্দুকে দায়ী করে এবং স্বদেশী হাঙ্গামার সময় পুলিশের পোষা মেয়েচরের অভিযোগে তাকে অপবাদ দেওয়া হয়। বিন্দুর মতো অসহায় নারীকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে মৃণালের স্বামী তার প্রাপ্য হাত-খরচের টাকা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়,

> "বিন্দুকে আমি যে সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম।"[১২]

বিন্দুকে ঘরছাড়া করার শেষ উপায় হিসেবে তার বিয়ে ঠিক করা হয় এক পাগলের সাথে। অবশেষে সেই পাগলের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে বিন্দু আত্মহত্যা করে। গল্পের শেষে মৃণাল কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়, পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। পরিবারের দ্বারা পীড়িত ও অসহায় নারীদের প্রতিভূ হয়ে, ২৭ নং মাখন বড়ালের গলি চিরদিনের জন্য ছেড়ে বের হয় নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "যে অভ্যাসের আবরণে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাহীন পরিবার মৃণালকে সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে পনেরো বছর অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু এসে সেই আবরণকে ছিন্ন করে দিল। পুরুষশাসিত সমাজ কিভাবে নারীকে অপমানে বন্দি করে রাখে, তা মৃণাল বিন্দু ও নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করেছে। মৃণাল মুক্তি গ্রহণ করেছে, সে বেঁচেছে। ব্যক্তির মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘোষণায় গল্পের সমাপ্তি।"[১৩]

গল্পে মূলত স্ত্রীজাতির প্রতি তীব্র অসম্মান, অবজ্ঞা, অপমান ও অবহেলা দেখানো হয়েছে। কিন্তু মৃণাল সমস্ত নারীজাতির প্রতিনিধি হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এবং অন্যায় ও অপবাদকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাখায় নিম্নজিত শিকড় ছিঁড়ে, নতুন আবেগের আশায় বেরিয়ে এসে মৃণাল স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা উপেক্ষা করে নারীদের নিজস্ব সত্তা প্রকাশের বার্তা ছড়িয়েছে। গল্পে প্রতিবাদী মনোভাবের দ্বারা মৃণাল শুধু নিজেকেই রক্ষা করেনি বরং তার সাহস ও দায়িত্ববোধ নারীদের জন্য এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গল্পের মৃণাল চরিত্র আমাদের শেখায় যে নারী শুধু নিজ পরিবার কিংবা সমাজের জন্য নয় বরং প্রয়োজন হলে নিজের মর্যাদার জন্যও লড়াই করতে পারে।

সাধারণ সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতে হয়। কখনও কখনও সেই প্রথা মানুষের হিতেই কাজ করে, আবার কখনও তা সেই মানুষের জন্যই বিপদস্বরূপ হয়ে ওঠে। প্রথা মেনে চলতে চলতে যখন তা অসহনীয় হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় প্রতিবাদ। সামাজিক নিয়মের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা হলো পণপ্রথা, যা সমাজকে ভিতর থেকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। সাধারণত গরীব বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এই পণপ্রথার শিকার হয়। পণপ্রথায় জড়িত সমাজের চরম দুর্দশার চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'দেনাপাওনা' গল্পে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়েছেন। লেখক ঊনবিংশ শতকের পারিবারিক বাস্তব জীবনের যে প্রতিচ্ছবি এই গল্পে তুলে ধরেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন:

> "আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব-জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"[১৪]

'দেনাপাওনা' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পে তিনি প্রথাগত ধারণার সীমারেখা অতিক্রম করে দেখিয়েছেন, কীভাবে পিতা ও পরিবারের লোভের কারণে একটি নববিবাহিত মেয়ের জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে। গল্পে দেখা যায় রামসুন্দর মিত্র সাধারণ এক পরিবারের মানুষ, যার একমাত্র কন্যা নিরুপমা। পাঁচ পুত্র সন্তানের পর একমাত্র কন্যার জন্ম হওয়ায় তিনি তাকে বিশেষভাবে আদর করতেন এবং তার নাম নিরুপমা রেখেছিলেন। সমাজে কন্যা সন্তানকে প্রায়শই অবহেলা করা হলেও রামসুন্দর পুত্রের চেয়ে কন্যাকে বেশি আদর করতেন। সেই আদরের কন্যাকে সারাজীবনের জন্য সুখী করতে পিতা তার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে শুরু করলেন। নানা জায়গায় পাত্র অনুসন্ধানের পর অবশেষে রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রকে তিনি পছন্দ করলেন। নিজের একমাত্র মেয়েকে সুখী করতে তিনি বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী ১০,০০০ টাকা পণ নগদ দিতে সম্মত হন। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ না থাকায় বিয়ের সময় পর্যন্ত পুরো টাকা জোগাড় করতে পারলেন না, ফলে বিয়ে স্থগিত হয়ে যায়।

একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য রামসুন্দর অনুনয়-বিনয় শুরু করেন, রায়বাহাদুরের কাছে বলতে থাকেন:

> "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব। রায়বাহাদুর বলিলেন, টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"[১৫]

কিন্তু বর, যিনি শিক্ষিত ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, সমাজের এ ধরনের বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে পিতার বিরুদ্ধেও বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বললেন:

> "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব!"[১৬]

অবশেষে রায়বাহাদুরের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে সম্পন্ন হয়। পিতা কন্যাকে অশ্রুজলে বিদায় জানান। কিন্তু শশুরবাড়িতে পৌঁছাতেই শুরু হয় নিরুপমার উপর নানান ধরনের অত্যাচার। রামসুন্দর পণের সম্পূর্ণ টাকা না দিতে পারায় নিরুপমাকে চিরদিনের জন্য বাবার বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বহুবার চেষ্টা করেও পিতা মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। মেয়ের জীবনে এই চরম কষ্টের মধ্যে পিতা নিজস্ব বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়েছেন। একবার নিরুপমা তার বাবার বাড়ি যেতে চাইলে রামসুন্দর গোপনে তিন হাজার টাকা নিয়ে যান, মেয়ের শশুর বাড়ি দেওয়ার জন্য। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

> "'থাক্, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।"[১৭]

দিনের পর দিন নিরুপমা ও তার পিতা সামাজিক অপবাদের শিকার হন। অবশেষে রামসুন্দর নিজের একমাত্র বসত বাড়ি বিক্রি করে কন্যার পণের টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু বড় পুত্র হরমোহন বাধা দেন। নিরুপমা জেনে বাধার কথা স্পষ্টভাবে জানায়, সে কখনো পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবে না যদি পিতার টাকা শশুর বাড়িতে আসে। সে প্রতিবাদ করে বলেন:

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।"[১৮]

এই অবস্থান থেকে নিরুপমা প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে দৃঢ় পরিচয় দেয়। কিন্তু শশুরবাড়ির অত্যাচারের ফলে নিরুপমা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাসীরা খাবারের নিয়ম না মানায় ও পরিবারের অপমানে তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। মৃত্যুর মুখে এসে পিতার বাড়ি যেতে চাইলে তার শাশুড়ি তাকে ব্যঙ্গ করে নানান কটুকথা বলেন। অবশেষে নিরুপমাকে দেখতে শেষ বারের জন্য ডাক্তার আসে এবং তার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর থেকে অজানা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যখন তার পরিবারকে চিঠি লেখে তার স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে জানায় তখন তার মা চিঠির উত্তর দেন,

> "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[১৯]

এই গল্পে দেখা যায়, নিরুপমার মৃত্যুর পেছনে শুধুমাত্র শশুরবাড়ি বা সমাজই দায়ী নয়, তার পিতার দায়িত্বও সমানভাবে প্রভাবিত। বড়পণ সমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথা হলেও রামসুন্দর মেয়েকে সুখী করতে সেই পরিবারকে বেছে নেন, যেখানে পণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না। অপরদিকে নিরুপমা নিজে চরম অত্যাচারের ফলে নিজের

খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হন। অবশেষে নিজের পরিচর্যার অভাবে মৃত্যুর মুখে পড়েন। কৌলিন্য প্রথা থেকে উদ্ভূত বিদ্বেষ ধীরে ধীরে সমাজকে ধ্বংস করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পে পণপ্রথা ও তার ফলাফলকে নিরুপমার চরিত্রের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণ পরিবারের একটি মেয়ের মৃত্যু প্রমাণ করেছে প্রথার নির্মমতা এবং লেখক বাস্তব প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি প্রতিবাদী মনোভাবনারও চিত্র স্থাপন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে মানুষ আকর্ষণের তীব্র ক্ষমতা আছে, যা লেখকের দক্ষতার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ তিনি ছোটগল্পকে বাংলাসাহিত্যের উচ্চশিখরে নিয়ে গেছেন। পারিবারিক নারীর সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে তার কর্মজীবন পর্যন্ত তিনি নারীর জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধির প্রতিফল আমরা তার লিখিত ছোটগল্পে দেখতে পাই। উপরোক্ত আলোচিত 'স্ত্রীরপত্র', 'হৈমন্তী' ও 'দেনাপাওনা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক নারী সমস্যা, সমাজের প্রথা, পণপ্রথা ও শশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নারীর উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজ নারীর ওপর সাধারণ নিয়ম মেনে চলার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সমাজের অসহনীয় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে অনেক নারী নিজের আত্মসমর্পণ করেছে, ঠিক তেমনি অনেক নারী সেই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজের প্রতি হুঙ্কার তুলেছে। এই উভয় প্রকার নারী চরিত্রের চিত্র আমরা এই গল্পগুলিতে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীরা প্রতিনিয়ত সমাজ ও পরিবারের দ্বারা লাঞ্ছনা, অপবাদ, বহিষ্কার, অবমাননা, শোষণ ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে চলেও তাদের আত্মসচেতনতা ও নিজস্ব বিকাশ ধরে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্পের মাধ্যমে পাঠককে সাধারণ জনজীবনে প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা থেকে বের হয়ে সমান চোখে সবাইকে দেখার শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নারী হিসেবে নারীর ক্ষতি নয়, বরং এক নারীকে অন্য নারীর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন। কারণ প্রকৃত মুক্তি উভয়ের স্বাধীন ও অধিকারসম্পন্ন জীবনের মধ্যেই নিহিত।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬, পৃ. ৪৮২।
২. তদেব, পৃ. ৪৮৪।
৩. তদেব, পৃ. ৪৮৫।
৪. তদেব, পৃ. ৪৮৫।
৫. তদেব, পৃ. ৪৮৭।
৬. তদেব, পৃ. ৪৮৯।
৭. তদেব, পৃ. ৪৯০।
৮. মিশ্র, ড. অশোককুমার। রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা। প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৬৩।
৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৪৯৮।
১০. তদেব, পৃ. ৪৯৯।
১১. তদেব, পৃ. ৫০১।
১২. তদেব, পৃ. ৫০২।
১৩. ঘোষ ড. বিজিত, বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা, পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১১৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩১।
১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ,প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১০।

১৬. তদেব, পৃ. ১০।
১৭. তদেব, পৃ. ১২।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩।
১৯. তদেব, পৃ. ১৪।

আকরগ্রন্থ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। প্রকাশক: শংকর মণ্ডল, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার। রবীন্দ্র-সমীক্ষা। প্রকাশক: শ্রী অমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টার এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।
২. ঘোষ, ড. বিজিত। বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত।
৩. মিশ্র, ড. অশোককুমার। রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা। প্রকাশক: সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৪. দেবনাথ, ড. ননী গোপাল। গল্পগুচ্ছের নির্মাণশৈলী। অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।
৫. দত্ত, সুমিত্রা। রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। প্রকাশক: শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ অক্ষর বিন্যাস: এন. ই. পাবলিশার্স ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন কলকাতা ৭০০০৩৫।